যুগান্তর

তারিখ ১৪ OCT 2015
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

ছাত্রলীগ বশীকরণ ফর্মুলা

জাতি নিমের পাতা

মাহবুব কামাল

ঈদের কয়েকদিন আগে প্রকাশিত ছাত্ররাজনীতি বিষয়ক আমার লেখাটায় প্রতিশ্রুতি ছিল ঈদের ইমিডিয়েট পরের কলামে সংকট থেকে উত্তরণের প্রয়াস নেয়া হবে। দেখা যাক। বলে নিই, আওয়ামী লীগ এখন ক্ষমতায় যেহেতু, সেহেতু ছাত্রদল আমাদের এজেন্ডা নয়, ছাত্রলীগই লক্ষ্যবস্তু।

আপাতদৃষ্টিতে আমাদের মনে হচ্ছে, ছাত্রলীগকে বশে আনা কিংবা পোষ মানানো খুব কঠিন কাজ; কিন্তু কাজে হাত দিলে দেখা যাবে হাতের চেয়ে কাজই নড়ছে বেশি, কাজটা এগিয়েও যাচ্ছে তরতর। বস্তুত কাজে নামাটাই আসল কথা, প্রস্তুতি নিয়ে নামলে তো কথাই নেই।

হ্যাঁ, ছাত্রলীগকে পুনর্বিন্যস্ত করতে হলে আমাদের কিছু প্রস্তুতি প্রয়োজন এবং এই প্রস্তুতির আগে সিদ্ধান্তগুলো নিতে হবে দুটি বড় কর্তৃপক্ষকে। এক. সরকার, বিশেষত এর প্রধানমন্ত্রী। দুই. ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। প্রথমে সরকারের কথাই আসুক।

ছাত্রলীগের ব্যাপারে সরকার যে কঠোর অবস্থান নিচ্ছে না, এর দুটি কারণ থাকতে পারে। প্রথম কারণটা— প্রধানমন্ত্রী ভেবে থাকতে পারেন, ছাত্রলীগের ব্যাপারে যতটা কঠিন হওয়া প্রয়োজন, ততটা কঠিন হলে তার গণতান্ত্রিক মানস বিদ্ধ হয়ে পড়বে। হাজারীবাগের রিজুকে ক্রসফায়ার করার পর এমন কিছু প্রশ্ন উঠেও ছিল। ক্রসফায়ার প্রসঙ্গে আমরা পরে ফিরব। কথা হচ্ছে, অপরাধীর প্রতি কঠোর হলে গণতন্ত্রের ক্ষতি হয়, এই পিকিউলিয়ার চিন্তা যদি প্রধানমন্ত্রীর থেকে থাকে, তাহলে তা হবে গণতন্ত্রের অতি সরলীকরণ। গণতন্ত্রের ক্ষতি হয় ভিন্নমতের প্রতি কঠোর হলে, অপরাধীর প্রতি কঠোর হলে গণতন্ত্র আরও মজবুত হয়। এ প্রসঙ্গে হেনরি মেইনের কথাটি স্মরণ করা যেতে পারে। বলেছেন, 'গণতন্ত্র আদর্শগতভাবে সর্বোত্তম শাসনব্যবস্থা সত্যি, তবে সন্দেহাতীতভাবে এটাই সবচেয়ে জটিল সরকার পদ্ধতি।' সন্দেহ কী, গণতন্ত্র চর্চার সঙ্গে আইনের শাসনের সমন্বয় না ঘটাতে পারলে গণতন্ত্র দুরূহই থেকে যায়। এ কী কম কঠিন কথা— মানুষের স্বাধীনতা থাকবে, মত প্রকাশের অধিকার থাকবে, আবার এই স্বাধীনতার সুযোগে যাতে অপশক্তি মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে! এই কঠিন প্রশ্নের সুরাহা করতে না পারলে বোকারাই শুধু সরকারের ধরন (Form of government) নিয়ে তর্ক করবে, বুদ্ধিমানরা বলতে বাধ্য হবে— যে সরকার সবচেয়ে ভালো শাসন করে, সেই সরকারই উত্তম সরকার।

দ্বিতীয় যে কারণে ছাত্রলীগের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী কঠোর অবস্থান নিচ্ছেন না, সেটা হল, তিনি হয়তো ভাবেন ছাত্রলীগের শক্তি ক্ষয় হওয়া মানে আওয়ামী লীগেরও ক্ষতি হওয়া। এ চিন্তার প্রথম ফ্যালাসিটা হচ্ছে, ছাত্রলীগ এখন আর শক্তি নয়, অপশক্তি। দ্বিতীয় কথা, এই অপশক্তিকে দমন করলে আওয়ামী লীগ বরং আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। একটা অন্যরকম উদাহরণ দিই। ধরা যাক, কোনো এক জেলায় সরকারি কিছু পদে নিয়োগ দেয়া হবে। দলীয়করণের ভিত্তিতেই সব পদে নিয়োগ দেয়া হল এই ভেবে যে, তাতে দলের প্রতি সমর্থন বাড়বে। এখানে ফ্যালাসিটা হল, এই প্রক্রিয়ায় যত লোক সন্তুষ্ট হয়েছে, অসন্তুষ্ট হয়েছে তার কয়েক গুণ বেশি, যারা বঞ্চিত হয়েছে, তারা। আলটিমেটলি সরকারের সমর্থন বাড়লো, না কমলো? ছাত্রলীগের এক সন্ত্রাসীকে শাস্তি দিলে যে ১০০ ভুক্তভোগী খুশি হয়, এটাও কি বোঝেন না প্রধানমন্ত্রী? অবশ্য তিনি যদি মানুষের মাথা না গুনে তার হাতের বন্দুক গোনেন, তাহলে ভিন্ন কথা।

এক হিসেবে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের আজকের সন্ত্রাস একটি অনিবার্য সামাজিক উপসর্গ। স্বাধীনতা সংগ্রাম, বিপ্লব, অভ্যুত্থান ইত্যাদি ঘটনায় শুভ শক্তির যেমন জয় হয়, পাশাপাশি এসব ঘটনায় যে ব্যাপক বিশৃংখলা থাকে, তার গর্ভ থেকে কিছু অপশক্তিও জন্ম নেয়। ল্যাটিন আমেরিকার পাঁচটি দেশের মুক্তিদাতা সায়মন বলিভার তো বলেইছিলেন— Revolution devours its own children — বিপ্লব তার নিজের সন্তানদের গ্রাস করে ফেলে। বিপ্লব কিংবা অভ্যুত্থান শেষে তাই অপশক্তিকে দমন করতে হয় শক্ত হাতে এবং তা আইনের শাসনের মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধু '৭২ সালে পৃথিবীর অন্যতম গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়ন করে গণতান্ত্রিক শাসন নিশ্চিত করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসা অপশক্তিসমূহকে আইনের শাসনের মাধ্যমে দমন করতে না পারায় সামাজিক বিশৃংখলা ঠেকাতে পারেননি। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন, সদ্যস্বাধীন দেশে কঠোর হওয়া মানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ক্ষতি হয়ে যাওয়া। ব্যর্থ, হতাশাগ্রস্ত, অভিমানী বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে তিন বছরের মাথায় দোষ ধরেছিলেন নির্দোষ সংবিধানের, ভেবেছিলেন সংবিধান সংশোধন করলেই বুঝি ফিরে আসবে শান্তি।

'৯০-এর অভ্যুত্থানও কিছু অপশক্তির জন্ম দেবে, এটাই স্বাভাবিক। '৯০-এ '৭১-এর মতো অস্ত্রের খেলা হয়নি সত্য; কিন্তু ছাত্র ও যুব সমাজের একটা মারাত্মক যুদ্ধংদেহী তৎপরতা, তো ছিলই। এই যুদ্ধংদেহিতা ছিল অভ্যুত্থানের স্বার্থেই এবং অভ্যুত্থান শেষে যখন তার আর প্রয়োজন নেই, তখন এই বেপরোয়া শক্তিকে শক্ত হাতে ধারণ না করায় তা গতিপথ পরিবর্তন করে বেপথু হয়েছে।

হ্যাঁ, কঠোর হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হবে প্রধানমন্ত্রীকে। এই কঠোরতা কি ক্রসফায়ার? না। এমনকি হত্যা করার সময় চাক্ষুষ ধরা পড়লেও হত্যাকারীকে ক্রসফায়ারে দিতে নেই। প্রশ্নটা আদর্শিক, এই অর্থে যে, শাস্তির রায় দেয়ার একটি বৈধ কর্তৃপক্ষ থাকতে হবে। ক্রসফায়ার হচ্ছে অবৈধ সামারি ট্রায়াল। বৈধ সামারি ট্রায়ালের ব্যবস্থা করা যায় কি-না, ভেবে দেখা যেতে পারে। সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজি-দখলদারিত্ব ইত্যাদি বিচারের জন্য জেলায় জেলায় সামারি কোর্ট প্রতিষ্ঠা ও সেই কোর্টে অনধিক ৭ দিনের মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করার আইন করা যেতে পারে না কি? অবশ্য সামারি কোর্ট বসিয়ে যদি ছাত্রলীগ বাদ দিয়ে ছাত্রদলের নির্দোষ কর্মীদের নাম ধরে ডাকা হয়, তাহলে তা না বসানোই ভালো।

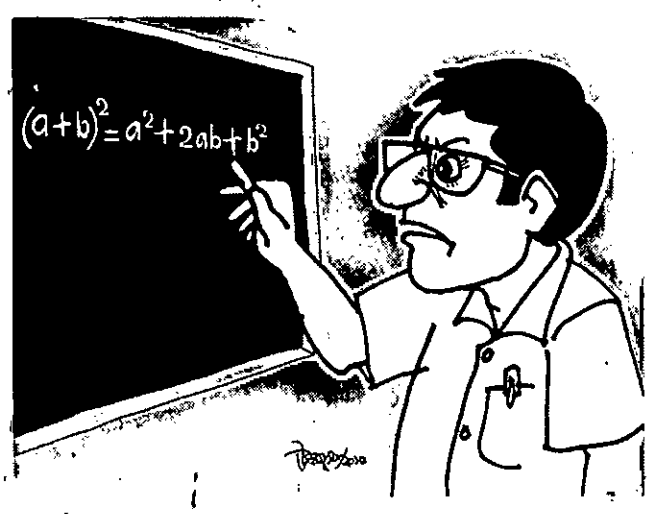

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এ পর্যায়ে একটা ভ্যালিড প্রশ্ন করি। আমাদের উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিশেষত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কি রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডের বাইরের কোনো এলাকা? যদি না হয়, সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রশ্ন— সেখানে দেশের প্রচলিত আইন প্রবেশ করতে পারে না কেন? ক্যাম্পাসে পুলিশ ঢুকলে ছাত্রছাত্রীরা চেঁচিয়ে ওঠে— বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্রতা নষ্ট হচ্ছে। তাদের আইনের বাইরে রাখার এটাই কি কারণ? আমাদের চারদিকে শুধু মহান আর মহান, পবিত্র আর পবিত্র। একটু কিছুতেই নষ্ট হয় মহানত্ব আর পবিত্রতা। রমজানে হোটেল খোলা রাখলে রোজার পবিত্রতা নষ্ট হয়, সংসদের কার্যক্রম নিয়ে প্রশ্ন তুললে এর মহানত্ব, নষ্ট হয়, মুক্তিযুদ্ধের মূল্যায়ন নিজেরটার সঙ্গে না মিললে এর গৌরব অবমাননা করা হয়। একবার সম্পাদকীয়তে মহান সংসদ না লিখে শুধু সংসদ লিখেছিলাম। এক কলিগ প্রশ্ন তুললে বলেছিলাম— আগে বলেন কে মহান? সংসদ ভবনের আর্কিটেক্ট লুই কান, নাকি ওখানে যারা বসেন তারা? এদেশে মুসলমানদেরই ধর্মীয় অনুভূতি থাকে এবং তারা আঘাত পায়; অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় অনুভূতিই নেই, আঘাত পাবে কীভাবে? পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্যাম্পাসেরই শুধু পবিত্রতা থাকে, বাকি সব এলাকাই অপবিত্র! অবাক ব্যাপার, ক্যাম্পাসের পবিত্রতা নষ্ট করছে যারা, তারাই কি-না বলছে পুলিশ ঢুকলে পবিত্রতা নষ্ট হয়। ছাত্র সমাজের এই আপ্তবাক্যকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না কোনোভাবেই। পুলিশ কেন, প্রয়োজনে র‍্যাব ঢুকবে ক্যাম্পাসে। ভেঙে চুরমার করতে হবে সন্ত্রাসীদের সংঘবদ্ধতা, তাদের উন্মত্ত মানসিক গঠন। ফাজলামোর একটা সীমা থাকা চাই।

ছাত্রলীগের ব্যাপারে নিতে হবে আরও একটি সিদ্ধান্ত। বিশেষ প্রয়োজন এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া ছাত্রলীগের কোনো নেতা-কর্মী সরকারি অফিস-আদালতে প্রবেশ করতে পারবে না। টেন্ডার প্রক্রিয়া প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে, সংশ্লিষ্ট দফতরের দায়িত্বশীল কোনো কর্মকর্তা এমন অভিযোগ করলে, অনতিবিলম্বে অভিযুক্তকে আনতে হবে আইনের আওতায়। সবচেয়ে বড় যে কথা, আইন-শৃংখলা বাহিনীকে নির্ভয়ে দায়িত্ব পালন করার সুযোগ দিয়েই ক্ষান্ত থাকলে চলবে না, অভিযুক্তের পক্ষে তদবির করবেন যিনি, তার নাম প্রকাশ করার ক্ষমতা দিতে হবে তাদের।

২

ছাত্রলীগকে বশে রাখতে এই সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের করণীয় প্রসঙ্গে আসা যাক। একটি চীনা প্রবাদ দিয়েই শুরু করি— ভালো লোহা দিয়ে পেরেক হয় না আর ভালো মানুষ দিয়ে হয় না যোদ্ধা। ছাত্রলীগের বর্তমান কার্যক্রম যা, তাতে ভালো ছাত্র এতে মানায় না। ছাত্রলীগকে আসলে ভালো ছাত্রসর্বস্ব করে তুলতে হবে। সংগঠনটির অতীত গৌরবের যে পুঁজি, তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। নতুন পুঁজি সংগ্রহ না করলে প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখা যাবে হয়তো কোনোভাবে, একে লাভজনক করা যাবে না। পাঞ্জাবির পকেট থেকে দাদা বেখেয়ালে কত কত শতকিয়া নোট ফেলে দিতেন, এই গল্প শুনিয়ে একশ বছর পর বনেদি হওয়া যাবে না। সুতরাং '৫২, '৬৬, '৬৯, '৭১-এর গৌরব ইতিহাসের পাতায়ই পড়ে থাক, মনোনিবেশ করতে হবে নতুন ইতিহাস গড়ায়।

দেশের ওপর যখন কোনো ঔপনিবেশিক শক্তি কিংবা সামরিক স্বৈরতন্ত্র ভর করে নেই, তখন আমরা যে ছাত্ররাজনীতি মেনে নিচ্ছি— এটাই তো অনেক বড় ছাড়। কিংবা ধরুন, ছাত্রসমাজকে তো আর কোরিয়ার মতো জবরদস্তিমূলক সেনাবাহিনীতে ঢোকানো হচ্ছে না যে, রাজনীতি করে তা ঠেকাতে হবে। অথবা এমনও নয় যে, ষাটের দশকে মার্কিন ও ইউরোপীয় ছাত্রসমাজ যে যুদ্ধবিরোধী ও পরিবেশবাদী আন্দোলন করেছিল, ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল তেমন আন্দোলন করছে। আরও বলি, একসময় আসামে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভাব পূরণ করতে প্রফুল্ল মাহান্তের নেতৃত্বে ছাত্রসমাজ যে রাজনীতি করতে বাধ্য হয়েছে, তেমন প্রয়োজনও দেখা দেয়নি এখানে। দেশে একটি সুশিক্ষিত, মধ্যবিত্তীয় সুশীল সমাজসহ রয়েছে অনেক রাজনৈতিক দল। যুদ্ধবিগ্রহ নেই, ঔপনিবেশিক শক্তি নেই, সামরিক স্বৈরতন্ত্র নেই, আছে রাজনৈতিক দল ও সুশীল সমাজ, তারপরও আমরা ছাত্রসমাজকে দিব্যি দিচ্ছি না— তোমরা রাজনীতি করো না। তো আমরা যখন তাদের সহ্য করে চলেছি, তারা কি আমাদের কথার প্রতি সংবেদনশীল হতে পারে না? হ্যাঁ, ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এদিকে তাকান।

প্রথমত, ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র ও আদর্শ-লক্ষ্য সংবলিত পুস্তিকা ব্যাপকভাবে সংগঠনের কর্মীদের সরবরাহ করুন এবং কাউকে সংগঠনের প্রাথমিক সদস্যপদ দেয়ার আগে এই দুই পুস্তিকার ওপর তার একটি মৌখিক পরীক্ষা নিন। জেলা-উপজেলায় ছাত্রলীগ শাখার নিজস্ব লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিন। এসব লাইব্রেরিতে থাকবে রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতির বই ছাড়াও প্রতিদিনের তিন-চারটি সংবাদপত্র। খরচ? স্থানীয় অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তিই পাওয়া যাবে, যারা তাদের নামে লাইব্রেরির নামকরণ করলে আর্থিক সহায়তা দিতে এগিয়ে আসবেন। এটা নিশ্চয়ই চাঁদাবাজি হিসেবে গণ্য হবে না। এক কথায়, সংগঠনের অভ্যন্তরে সৃষ্টি করতে হবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক সাংগঠনিক প্রক্রিয়া, যা রাজনীতিকে যুক্ত করবে শিল্পের সঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ছাত্রলীগের উদ্যোগে গড়ে তুলতে হবে স্টাডি-ফোরাম, আবৃত্তি সংঘ, ডিবেটিং সোসাইটি, শিল্পসম্মত সিনেমা দেখার জন্য সিনে ক্লাব। ভারতের দূরদর্শনে একসময় ইউজিসি প্রোগ্রাম উপভোগ করতাম। বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা একটি ডামি পার্লামেন্ট বানিয়ে পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের অভিনয় দেখানো হতো। স্পিকার, প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেতাসহ সবার পারফরমেন্স দেখে মনটা জুড়িয়ে যেত। এটাই তো হওয়ার কথা, ছাত্রাবস্থায় বড়জোর অভিনয় করা চলে, মূল কাজটি করবে সে ছাত্রত্ব হারানোর পর।

আমাদের রাজনীতি, সমাজ, রাষ্ট্র, প্রকৃতি— এসব বিশাল প্রেক্ষাপট উপলব্ধি করার জন্য দরকার একটি শিক্ষিত, যুক্তিশীল, দার্শনিক মানস। যে তরুণ প্রতিপক্ষকে হত্যার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র বা নিজের উপকার করতে চাইছে, জীবনের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করলে সে দেখতে পাবে— সবই মিছে।

দারিদ্র্য, বেকারত্ব, আকাঙ্ক্ষিত বহুলাংশে ব্যর্থতা ইত্যাদির কারণে তরুণ ও যুব সমাজের মধ্যে যে চাপ চাপ হতাশা, অস্থিরতা, অসহিষ্ণুতা— তা স্মরণে রেখেও বলতে পারি— যে যুবক টলস্টয়, সমারসেট মম-এর উপন্যাস পড়তে পারে; মানিক-বিভূতিকে আত্মস্থ করেছে; রবীন্দ্রনাথ, এলিয়ট, শামসুর রাহমানের কবিতা আবৃত্তি করে; রাফায়েল, দ্য ভিঞ্চির চিত্রকর্মের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারে; রোমান পোলানস্কি, সত্যজিতের ছবি দেখে তৃপ্ত হয়; দুঃখবোধে শেক্সপিয়র কিংবা জীবনানন্দের চরণ ধার করে, সে কখনও সন্ত্রাসী হতে পারে না। যার এক হাতে রাজনীতির, অন্য হাতে থাকে কবিতার বই, সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ।

মাহবুব কামাল : *সাংবাদিক*
mahbubkamal08@yahoo.com